# নানাবাড়ি ও দেওপাড়ার স্মৃতি

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কয়েকদিন আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি তখন ৫ম শ্রেনীতে পড়তাম। পড়তাম মানে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সন পর্যন্ত পড়ার পর যুদ্ধের জন্য সব স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর শীতকালে এবং বর্ষাকালে প্রতিবার প্রায় একমাস করে মার সাথে নানাবাড়ি কাটাতাম। ঐ সময় খালাও তার সন্তানদের নিয়ে আমার নানাবাড়ি আসতেন। আমার ছিল তিন মামা। আমার সমসাময়িক মামাতো খালাতো ভাইবোন মিলে আমরা খুব আনন্দ করতাম। নানার বড়ঘরের মেঝেতে ঢালাই বিছানা করে আমরা ৮/৯ জন শুইতাম। নানান রকম হাসির গল্প করতে করতে উলটা পাল্টা হয়েই কেউ কেউ ঘুমিয়ে পরতাম। নানী এসে কেচ কেচ করতেন। আমরা ঘুম না আসলেও ঘুমের ভান ধরে চোখ বন্ধ করে চুপ করে থাকতাম। নানী আমাদের একজন একজন করে এক হাত ও এক পা ধরে উচু করে গুছিয়ে গুছিয়ে শোয়ায়ে লেপকাথা দিয়ে ঢেকে রান্না ঘরে চলে যেতেন পিঠা বানাতে। আমরা নিচুস্বরে কিলকিলিয়ে হাসতাম। সেই পিঠা সকালে খেতাম। কি স্বাধই যে পেতাম!

খেলার সাথীদের সবাই সংক্ষিপ্ত নামে ডাকতাম। ফজু (ফজলু) ভাই একদিন বললেন "যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাকীরা দেওপাড়ার ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে। চল যাই আমরা ক্যাম্প দেখে আসি। আমার নানাবাড়ি কালিহাতির রৌহা গ্রামে। মরহুম আমীর উদ্দিন ছিলেন আমার নানা। ছোট নানা মরহুম কাজিম উদ্দিন মাস্টার। রৌহার ২ কিলোমিটার উত্তরে দেওপাড়া পাহারের টিলার উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঘাটি ছিল। ওখান থেকে তিন দিকের বিস্তির্ন এলাকা দেখা যেত। প্রতিদিন সকালে ধুরুম ধুরুম শব্দ করে গ্রামে গ্রামে ওখান থেকে শেল ফেলে আতংক তৈরি করা হত। একেক দিন একেক গ্রাম লুট করে নিয়ে যেত। আশ পাশের অনেক আত্বীয়সজন আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমাদের বাড়ী কাদেরিয়া বাহিনীর ঘাটির কাছে থাকায় আমরা মোটামুটি নিরাপদ ছিলাম। যুদ্ধের বছর বর্ষা কালে নানাবাড়ি যাওয়া হয়নি।

আমরা চারজন পরিত্যাক্ত ক্যাম্প দেখতে গেলাম। দেখলাম ৭/৮ ফুট গভীর চারকোনা করে গর্ত করে অনেকগুলি বাংকার (খন্দক) করা হয়েছে। এক বাংকার থেকে আরেক বাংকারে যাওয়ার জন্য ড্রেন এর মত কাটা হয়েছে। আমরা বাংকারে নেমে দেখলাম পাকীরা অনেক কিছু জিনিস ফেলে গেছে। বাংকারে লুকুচুরি খেললাম। ক্রোলিং করে এক বাংকার থেকে আরেক বাংকারে গেলাম। দেখলাম মুক্তিযোদ্ধারা বেশ আনন্দে আছে। আমাদেরও আনন্দ লাগলো। মাঠের মাঝখানে একজন একাই বসেছিলেন চেয়ারপেতে। রৌদ্র পোহাচ্ছিলেন। বাম হাতে রাইফেল নিয়ে ডান হাতে নেকড়া দিয়ে রাইফেল মুছতেছিলেন। ফজুভাই বললেন "উনি মনে হয় কমান্ডার। " চেয়ারে একটা বেত রাখা ছিল। আমরা কাছে গিয়ে উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম। বড় হয়ে চিনেছি তিনি সখিপুরের বড় মাপের একজন রাজনৈতিক নেতা। দুই দুই বার সখিপুরের মেয়র হয়েছেন। তিনি আবু হানিফ আযাদ। দুই বছর আগে আমার চাচাতভাই আব্দুর রাজ্জাক তালুকদার তাকে এক অনুসঠানে দাওয়াত দিয়েছিল। ওখানে তার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি বললাম "রাজ্জাক আমার ছোট ভাই"। তিনি বললেন "আপনার ছোট ভাই আমার পার্টি না করলেও আমি তাকে পছন্দ করি। " তখন আমার স্মৃতিতে সেই একাত্তরের রাইফেল পরিস্কার করার দৃশ্য ভেসে উঠলো। আসলেই তিনি তখন মুক্তি যোদ্ধাদের কমান্ডার ছিলেন।

কয়েক বছর আগে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে চাঁদনী রাত দেখে একাই নানাবাড়ি গেলাম। উদ্দেশ্য চাঁদনি রাতে মামাতো ভাইদের নিয়ে বিলের মাঝখানে ডিঙি নৌকা বেধে চিৎ হয়ে শুয়ে চাঁদ দেখব। মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া খালি গায়ে লাগাব। রাতে চুপ করে শুয়ে কোরা পাখী, কুরা পাখী ইত্যাদির ডাক শুনব।

দুপুরের পর নানাবাড়ি পৌছলাম। অনেক রুগী এসে হাজির। তারা জানতে পেরেছিল আমি আসবো। রুগী দেখে রাতের খাওয়া সেরে আমি, ফজু ভাই ও কাদের ভাই নৌকা নিয়ে বিলের মাঝখনে লগি গেড়ে পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে পরলাম। গায়ে হাওয়া লাগালাম। ছোট বেলার আলাপ শুরু করলাম। মনের সুখে বাউল গান ছারলাম " ফাকি দিয়ে থাকবি কত দিন,....। " কিন্তু তারা আমার গান শুনে না। বার বার একই কথা বলেন "ছেলেটাকে প্রাইভেট না সরকারি ইন্সটিটিউট এ পড়াব? না বিদেশে পাঠিয়ে দিব?"

রাত ১২ টার দিকে নানাবাড়ীতে ফিরলাম। খুব ক্লান্ত। ঘুম পাচ্ছে। দেখি ৬/৭ জন মহিলা রুগী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি বললাম "সকালে দেখব নে।" তারা বললেন "সকালে ছেলে মানুষএর সামনে আমরা রোগের কথা

বলতে পারব না। এখনি শুনুন"। রুগী দেখে শুয়ে পরলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গুমিয়ে পরলাম। সকাল হয়ে গেল। রাতে আমার কোরা ও কুরা পাখীর ডাক শুনা হল না। শুনা হল না দূর থেকে ভেসে আসা কোন বাউলের সুর।
======
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইস বুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
11/6/2017